মন্তব্য প্রতিবেদন

বিধবার ছাগল ভক্ষণ ও রেলমন্ত্রীর বিয়ে

● হাবিবুর রেজা

পঁয়ষট্টি বছরের বিধবা আলেয়া বেগম বেঁচে থাকার স্বপ্ন দেখেন। বাঁচতে চান তার দু মেয়ে আর এক ছেলেকে নিয়ে। বিধবার সঙ্গে আরো আছেন ছোট দু বোন। তাদের স্বামীরা বিদেশে রপ্তানি হয়েছেন জনশক্তি হিসেবে। কবে ফিরবেন, টাকা পাঠাবেন, তার কোনো ঠিক-ঠিকানা নেই। বলা চলে, একটি নারীকেন্দ্রিক সংসার। পুরুষ সদস্য থেকেও নেই, কাজের সন্ধানে চলে গেছে এলাকা ছেড়ে অন্য এলাকায়, এ রকম পরিবার বাংলাদেশে অনেক আছে। সেদিক থেকে এটি কোনো ব্যতিক্রমী ঘটনাও নয়। তিন বোন মিলে একটি ছাগলের খামার গড়ে তুলেছিলেন। খামারটিতে শেষ পর্যন্ত ছাগলের সংখ্যা দাঁড়িয়েছিল ২৯-এ। বেঁচে থাকার জন্য মানুষ কত কী না করে! তারাও তাদের মতো করে একটি সম্মানজনক বৈধ উপার্জনের পথ বেছে নিয়েছিলেন।

কিন্তু আলেয়া বেগম ও তার পরিবারের আরো পাঁচ সদস্যের দুঃখের শুরু হলো তখন, যখন খামারটির ওপর আওয়ামী লীগের এক কাউন্সিলর নেত্রীর চোখ পড়ল। হঠাৎ করেই নারী কাউন্সিলর হোসনে আরা সিদ্দিকা জুলির মনে হলো, ওই বাড়িতে কোনো পুরুষ সদস্য নেই! এলাকার অন্য নারীরা আলেয়া বেগমের ছাগল পালন কার্যক্রমে উৎসাহিত হচ্ছিলেন, তারা তাই আলেয়া বেগমের বাড়ি যেতেন, খামারের ছাগলের জাত নিতেন, সেটিও তার সহ্য হচ্ছিল না। তার বোধহয় মনে হচ্ছিল, নেত্রী হলেন তিনি, অথচ মানুষজন যায় আলেয়া বেগমের বাড়ি, এটা তো মেনে নেয়া যায় না। হোসনে আরা সিদ্দিকা জুলি ও অন্যান্য প্রভাবশালী লোকজন তাই বলতে শুরু করলেন, 'খামারের বাইরের লোকজনকে ছাগলের প্রজনন বীজ দেয়া হয়, বিষয়টি দৃষ্টিকটু', 'বাড়িতে কোনো পুরুষ সদস্য নেই, বিষয়টি দৃষ্টিকটু', 'খামারটি ছোট, ছাগলের সংখ্যা অনেক বেশি, বিষয়টি দৃষ্টিকটু' ইত্যাদি ইত্যাদি। অতএব একদিন হোসনে আরা সিদ্দিকা জুলির সুযোগ্য বোনপো জসীম উদ্দীন জসু তার দলবল নিয়ে হামলা চালালেন আলেয়া বেগমের বাড়িতে। মারধর করলেন সবাইকে।

এ ঘটনা ঘটেছে গাজীপুরে, নগরীর পূবাইল পূর্ব কুদাব বাগিচাপাড়ায়। হোসনে আরা সিদ্দিকা জুলি হলেন গাজীপুর সিটি করপোরেশনের ৪০ নম্বর ওয়ার্ডের সংরক্ষিত কাউন্সিলর, নৌকা মার্কার লোক। জসীম উদ্দীন জসু তার বোনের ছেলে। আরো একটি পরিচয় আছে ৩৫ বছর বয়সী জসুর, কুদাব ইউনিট আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক তিনি। তার বাহিনী এলাকায় পরিচিত জসু বাহিনী হিসেবে। গত জুলাই মাসে জুলি-জসু বাহিনীর হামলায় আক্রান্ত হওয়ার পর আলেয়া বেগমরা চেয়েছিলেন থানায় যেতে। কিন্তু এলাকায় জুলি-জসু বাহিনীর শুভানুধ্যায়ীর অভাব নেই। তারা আলেয়া বেগমদের ঠেকালেন, আশ্বাস দিলেন এলাকাতেই বিচার করা হবে।

তা বিচার একটা হয়েছিল বটে। সেখানে হোসনে আরা সিদ্দিকা জুলিও সশরীরে হাজির ছিলেন। সালিশে জুলি-জসু বাহিনীর কাউকে কোনো শাস্তি দেয়া হয়নি। উল্টো আলেয়া বেগমদেরই দোষী বানিয়ে ১০ হাজার টাকা জরিমানা করা হয়! তারপর জরিমানার টাকা দিতে দেরি হওয়ার অভিযোগ তুলে কয়েকদিন পর খামার থেকে আবার জুলি-জসু বাহিনীর লোকজন কয়েকটি ছাগল ধরে নিয়ে যায়। কুদাব সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের মাঠে ছাগল জবাই দিয়ে মাংস ভাগাভাগি করে নেয়া হয়। মাতব্বরদের বাড়িতেও পাঠানো হয় মাংসের ভাগ। সাংবাদিকদের কাছে আলেয়া বেগমের বড় মেয়ে জানিয়েছেন, সালিশের সময় বিচারকরা খামারে পুরুষ ছাগল রাখায় তার মায়ের চরিত্র নিয়ে আপত্তিকর মন্তব্য করেন। সেগুলো এতই মারাত্মক ছিল যে, তারা সবাই সেদিন আত্মহত্যার কথাও চিন্তা করেছিলেন। আবেগের বশে সে রাতে আত্মহত্যা করে বসলে জুলি-জসু বাহিনী নিশ্চয়ই আরো উল্লসিত হতো, এত সহজেই ল্যাঠা চুকে যাওয়াতে।

কিন্তু অনেক লাঞ্ছনা আর মর্মপীড়া নিয়েও আলেয়া বেগমরা এখনো বেঁচে আছেন। তাদের যে ছাগলগুলো ধরে নিয়ে জবাই করা হয়েছে, সেগুলোর মধ্যে গর্ভবতী ছাগলও ছিল। কিন্তু জুলি-জসু বাহিনী সেসবের তোয়াক্কা করেনি। এক অশ্লীল জান্তব উল্লাস নিয়ে তারা ছাগলগুলোকে জবাই করেছে, রান্না করে খাওয়া-দাওয়া করেছে। তিন বোন মিলে যে স্বপ্ন নিয়ে খামারটিকে গড়ে তুলেছেন, সেটিকে যেনতেন উপায়ে বন্ধ করে দেয়াই যে তাদের মূল লক্ষ্য, তা বলার অপেক্ষা রাখে না।

আমরা নারীদের ক্ষমতায়নের কথা বলি, সরকারও অহরহ বলে থাকে, এনজিও বা বিভিন্ন উন্নয়ন সংগঠনও কথায় কথায় এ রকম বলে থাকে। কিন্তু বাস্তবে যে সবাই নারীদের ক্ষমতায়ন প্রক্রিয়াকে দমিয়ে রাখতে চাই, তার একটি উদাহরণ এ ঘটনা, এ ঘটনার পর বিভিন্ন মহলের নীরবতা। একটি জাতীয় দৈনিক সংবাদপত্রে এ খবরটি এসেছে গত ৮ সেপ্টেম্বর। কিন্তু এখন পর্যন্ত ওই সন্ত্রাসীদের বিরুদ্ধে কোনো পদক্ষেপ নেয়ার কথা জানা যায়নি। আলেয়া বেগমদের স্বপ্ন ভেঙেচুরে খান খান হয়ে গেলেও সরকারের কিছুই করার নেই,

> আলেয়া বেগমদের স্বপ্ন ভেঙেচুরে খান খান হয়ে গেলেও সরকারের কিছুই করার নেই, কিছুই করার নেই আওয়ামী লীগেরও। সরকারের পক্ষ থেকে নারীদের উদ্যমী হতে বলা হয়, উদ্যোক্তা হতে বলা হয়। কিন্তু সে পথে পা বাড়ালে কত বড় মাসুল যে দিতে হয়, আলেয়া বেগমদের ওপর নেমে আসা নৃশংসতা থেকেই তা টের পাওয়া যায় ■

কিছুই করার নেই আওয়ামী লীগেরও। সরকারের পক্ষ থেকে নারীদের উদ্যমী হতে বলা হয়, উদ্যোক্তা হতে বলা হয়। কিন্তু সে পথে পা বাড়ালে কত বড় মাসুল যে দিতে হয়, আলেয়া বেগমদের ওপর নেমে আসা নৃশংসতা থেকেই তা টের পাওয়া যায়।

পরিশ্রম করে গড়ে তোলা খামার এভাবে ধ্বংসের মুখোমুখি হওয়াতে বিপর্যস্ত, ক্ষতবিক্ষত আলেয়া বেগমরা। রাজনৈতিকভাবে তারা ক্ষমতাহীন, তাদের পাশে দাঁড়ানোর মতো কেউ নেই। জীবনযুদ্ধের মাঠে আলেয়া বেগমরা আগেও নিঃসঙ্গ ও একাকী ছিলেন, এখনো সে রকমই আছেন।

আমাদের রেলমন্ত্রী মুজিবুল হকও নিঃসঙ্গ ছিলেন, একাকী ছিলেন। তবে এখন তিনি বিয়ের জন্য প্রতীক্ষমাণ। ৬৭ বছর বয়সী রেলমন্ত্রী এখন লাল টুকটুকে পাঞ্জাবি পরে সংসদে যাচ্ছেন। অধিবেশন কক্ষে পা রাখতে না রাখতেই তাকে অভিনন্দন জানাচ্ছেন অন্য সাংসদরা। আর তিনি গানের সুরে জবাব দিচ্ছেন তাদের, 'সবাই তো সুখী হতে চায়...।' হাজী মোহাম্মদ সেলিমও আবার এই সুযোগে মশকরা করছেন রেলমন্ত্রীর সঙ্গে, 'লাল লাল হোটমে, মুজিব তেরা নাম হ্যায়...'। সংসদের হালচাল যে কী, এ ঘটনা থেকেই বোঝা যায় তা, বোঝা যায় আমাদের প্রতিনিধিত্বকারী সাংসদদের কাজের বহর। বড় আওয়ামী লীগ নেতারা যেসব দুর্নীতি বা অনিয়ম করে থাকেন, তার খানিকটা হয়তো জাতীয় দৈনিক সংবাদপত্রগুলোতে আসে। কিন্তু প্রত্যন্ত অঞ্চলের আলেয়া বেগমদের ওপর স্থানীয় আওয়ামী লীগ নেতারা যে ধরনের বর্বরতা চালাচ্ছেন, তা কি কখনো কারো সামনে আসে? একেবারেই যে এসব খবর ছাপা হয় না, তা নয়। কিন্তু ছাপা হলেও সেসব থেকে যায় অনালোচিতই। পক্ষান্তরে 'লাল লাল হোটমে' নিয়েই অনেক বেশি ব্যস্ত থাকি আমরা। নইলে যে রেল মন্ত্রণালয়ের অবস্থা বেহাল বললেও কম বলা হবে, সেই রেল মন্ত্রণালয়ের দুর্গতি নিয়ে কথাবার্তা হওয়ার বদলে রেলমন্ত্রীর বিয়ে নিয়ে কেন এত কথা হবে!

রেলমন্ত্রী যেদিন লাল পাঞ্জাবি পরে সংসদে গিয়েছেন, তার পরদিন ১১ সেপ্টেম্বরেই কারওয়ান বাজার এলাকার রেলপথে ঘটেছে ভয়ানক এক দুর্ঘটনা। আর মর্মান্তিক ওই দুর্ঘটনায় মৃত্যু ঘটেছে চারজনের। বিশ্বের প্রায় সব দেশেই খোদ রাজধানীর বুকে রেললাইন আছে, কিন্তু সেসব জায়গায় বাজার বসে বলে জানা নেই আমাদের। অথচ এই ঢাকা শহরে সকাল হতে না হতেই বিভিন্ন এলাকার রেলপথের ওপর বসতে শুরু করে অস্থায়ী কাঁচাবাজার। এভাবে জিনিসপত্র নিয়ে বাজার বসানো ঝুঁকিপূর্ণ– তাদেরও তা জানা আছে। কিন্তু জীবন সংগ্রামে ব্যতিব্যস্ত এই মানুষদের অন্য কোনো বিকল্প নেই। রেল কর্তৃপক্ষের পক্ষ থেকে বলা হচ্ছে, মাঝেমধ্যেই তারা উচ্ছেদ অভিযান পরিচালনা করে এই বেআইনি কার্যক্রম বন্ধের চেষ্টা চালান। কিন্তু জীবন ও জীবিকার সংগ্রামে নিয়োজিত মানুষজন এত বেপরোয়া যে, কোনো কিছুর তোয়াক্কা করে না। আবার রেল কর্তৃপক্ষও কখনো বলে না, এই কার্যক্রম আসলে টিকিয়ে রেখেছে স্থানীয় এলাকার প্রভাবশালীরাই। টাকার বিনিময়ে, চাঁদার বিনিময়ে তারা দোকান বসাতে দিচ্ছে এসব অবৈধ দখলদারদের। তাই জীবন সংগ্রামে অনন্যোপায় ওই মানুষদের মৃত্যুর দায় নিঃসন্দেহে এই প্রভাবশালীরাও এড়াতে পারেন না। আর এই প্রভাবশালীদের সরকারি দলের সঙ্গে কোনো না কোনোভাবে রয়েছে সম্পর্ক। রেললাইনের ওপর দোকান বসাতে দেয়ার সুবাদে চাঁদাবাজি করছে তারা। খোদ ঢাকা মহানগরের কথাই ধরা যাক। একদিকে বিএফডিসি, অন্যদিকে কারওয়ান বাজার মাছের আড়ত– এর মধ্য দিয়ে চলে গেছে রেলপথ। কিন্তু দু পাশেই আবার রেলের জায়গা দখল করে গড়ে উঠেছে অসংখ্য দোকানপাট। আর শুধু দু পাশে কেন, রেললাইনের ওপরও প্রতিদিন বসছে অস্থায়ী বাজার। কেউ মাছ নিয়ে বসছে, কেউবা বসছে ফলমূল-সবজি নিয়ে, আবার কেউ গড়ে তুলেছে গাড়ি মেরামতের গ্যারেজ। সরকারি দলের প্রভাবশালী নেতা ও মাস্তানদের টাকা-পয়সা দিয়ে জীবনযুদ্ধে লিপ্ত অনন্যোপায় মানুষরা এভাবেই চেষ্টা করছেন বেঁচে থাকার। অন্যদিকে নেতা ও মাস্তানরা এর ফলে প্রতি বছর সামান্য ওই জায়গা থেকে চাঁদাবাজির মাধ্যমে হাতিয়ে নিচ্ছে কমপক্ষে দেড় কোটি টাকা। এই টাকার স্বাদ এত বেশি যে, রেল কর্তৃপক্ষ বার বার উচ্ছেদ অভিযান চালানোর পরও স্থায়ীভাবে উচ্ছেদ করতে পারছেন না অবৈধ দোকানপাটগুলো। পারছেন না নিরীহ মানুষের মৃত্যুকে ঠেকাতে। এভাবে রেললাইনের ওপর দোকান বসাতে দেয়ায় গত আট মাসে ঘটেছে অসংখ্য দুর্ঘটনা, ঢাকা ও তার আশপাশের এলাকায় মৃত্যু ঘটেছে ২৬৮ জনের। অথচ নিয়ম অনুযায়ী, কেবল রেলপথের ওপর দিয়েই নয়, এর ১০ গজের মধ্যেও লোকজনের প্রবেশ নিষিদ্ধ। নিয়ম অনুযায়ী, ছোট-বড় প্রতিটি ব্রিজেই পাহারা থাকার কথা। কিন্তু তা কখনই থাকে না। রেলপথের ৮০ শতাংশ এলাকাই নাকি এখন অরক্ষিত বা পরিদর্শনের বাইরে।

পত্রিকায় খবর এসেছে, রেলে আগের তুলনায় বিনিয়োগ বেড়েছে। ২০০৯ সালের পর থেকে রেলের উন্নয়নকল্পে প্রায় ২৫ হাজার কোটি টাকার উন্নয়ন প্রকল্প নেয়া হয়েছে। রেললাইন সংস্কার, নতুন রেলপথ নির্মাণ ও অবকাঠামো তৈরির লক্ষ্যে এসব প্রকল্প হাতে নেয়া হয়েছে। কিন্তু এত কিছু করার পরও রেল মন্ত্রণালয় গতিশীল হয়নি, বরং ৮৫ শতাংশ আন্তঃনগর ট্রেনের গন্তব্যে পৌছানোর সময় ১০ মিনিট থেকে ১ ঘণ্টা ২০ মিনিট পর্যন্তও পিছিয়ে গেছে। এর মধ্যে রেলের ভাড়াও বাড়ানো হয়েছে। কিন্তু তারপরও কি কোনো লাভ হয়েছে? গত বছরেই তো রেলের লোকসান হয়েছে ৬৩৩ কোটি টাকা!

রেলমন্ত্রী নতুন সংসারের স্বপ্ন দেখছেন– কামনা করি, তার সে স্বপ্ন সফল হোক। কিন্তু ট্রেনের ধাক্কায় যে চারজনের ও তাদের পরিবারের সদস্যদের স্বপ্ন হারিয়ে গেল, তাদের কী হবে? কী হবে বিধবা আলেয়া বেগম ও তার বোনদের? কেউ কি বলতে পারেন? ■

> রেলমন্ত্রী যেদিন লাল পাঞ্জাবি পরে সংসদে গিয়েছেন, তার পরদিন ১১ সেপ্টেম্বরেই কারওয়ান বাজার এলাকার রেলপথে ঘটেছে ভয়ানক এক দুর্ঘটনা। আর মর্মান্তিক ওই দুর্ঘটনায় মৃত্যু ঘটেছে চারজনের। বিশ্বের প্রায় সব দেশেই খোদ রাজধানীর বুকে রেললাইন আছে, কিন্তু সেসব জায়গায় বাজার বসে বলে জানা নেই আমাদের। অথচ এই ঢাকা শহরে সকাল হতে না হতেই বিভিন্ন এলাকার রেলপথের ওপর বসতে শুরু করে অস্থায়ী কাঁচাবাজার